অন্বেষণ

জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ : একটি অনুধ্যান

প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা

ওড়িশার সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতির উৎস বিশ্বের বিস্ময়দেবতা শ্রীজগন্নাথ। প্রভু স্বয়ং এমন রহস্যাচ্ছন্ন যে, তাঁর কাছে মানুষের চিন্তা, চেতনা, হিসাবনিকাশ সমস্ত হার মানে। এসবের অতীত, অত্যন্ত গূঢ় এবং রহস্যাবৃত তাঁর রূপ ও লীলা। তাঁর উপাসনার বৈশিষ্ট্যও অনন্যসাধারণ। এখানে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রাধিপতি উভয়ে একই নামে পরিচিত। মহাপ্রভুর মন্দির তাঁর নামে নয়, মহালক্ষ্মীর নামে খ্যাত—শ্রীমন্দির। কাছে সমুদ্র-মহোদধি। সুউচ্চ মন্দিরের চূড়া পরিশোভিত নীলচক্রে, শ্রীক্ষেত্রগামী ভক্ত বহুদূর থেকে যার দর্শনে আনন্দে বিভোর হয়। তাঁকে নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ। ভক্তমানসে মহাপ্রভু এবং মহাপ্রসাদ অভিন্ন।

ভগবান বিষ্ণু উত্তরে স্নানমূর্তি বদ্রীনাথ, দক্ষিণে শয়নমূর্তি রামেশ্বর, পশ্চিমে বেশমূর্তি দ্বারিকানাথ এবং পূর্বে শ্রীক্ষেত্রে ভোজনমূর্তি শ্রীজগন্নাথ রূপে আরাধিত। কলিযুগ অন্নময়। মানব সত্যযুগে মজ্জাগত প্রাণ, ত্রেতাযুগে অস্থিগত প্রাণ, দ্বাপরে রক্তগত প্রাণ, আর কলিযুগে অন্নগত প্রাণ। জগন্নাথমূর্তি প্রতিষ্ঠার পর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের ভক্তি ও তপস্যায় সন্তুষ্ট শ্রীজগন্নাথ তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজার একাধিক প্রার্থনার মধ্যে একটি ছিল—প্রভুর হাত যেন কখনও শুষ্ক না থাকে। উদ্দেশ্য, প্রভু সারাদিন নৈবেদ্য গ্রহণ করলেই বিশ্ববাসী তাঁর প্রসাদ থেকে কখনই বঞ্চিত হবেন না।

শ্রীমন্দির হওয়ার আগে শ্রীজগন্নাথ শবররাজা বিশ্বাবসু প্রদত্ত রাঙালুর নৈবেদ্য গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত থাকতেন। শ্রীমন্দিরের ইতিহাস 'মাদলাপাঞ্জি'

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ

থেকে জানা যায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা যযাতিকেশরী (প্রথম) মহাপ্রভুর নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। সেই মন্দির ধ্বংস হয়ে গেলে দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গদেব ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু শ্রীমন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কার্য সম্পূর্ণ করে শ্রীবিগ্রহদের প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর আদি সেবক জরাশবরের বংশধরদের দেবসেবকরূপে নিযুক্ত করা হয়; তাঁরা 'সুআর' নামে পরিচিত হন। মাদলাপাঞ্জি অনুযায়ী ১৯১০ সালে ভোগের সংখ্যা ছিল ৪৩৫, পরে তা ১৫০-এ হ্রাস পায়। বর্তমানে অন্ন, ডাল, ডালমা, মহুর, বেসর ও শাক বাদ দিয়ে সেই সংখ্যা ৫৬-তে পৌঁছেছে। প্রত্যহ এই ব্যঞ্জনগুলি ছাড়া বিভিন্ন উৎসবে স্বতন্ত্র নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ প্রস্তুত করার জন্য রাজা দিব্যসিংহদেব (১৬৮৭-১৭১৩) একটি পাকশালা নির্মাণ করান। বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১০০ ফুট প্রস্থের চতুষ্কোণ পাকশালাটি শ্রীমন্দিরের অগ্নিকোণে অবস্থিত ও মাঙ্কড়া পাথরে নির্মিত। প্রত্যেক উনুনে ছয়টি ঝিক বিশিষ্ট ষট্ কোণাকৃতি অগ্নিযন্ত্র থাকে। কোঠভোগের জন্য স্বতন্ত্র উনুন ছাড়া বিভিন্ন রাজা, জমিদার ও মঠগুলির নামে এগারোটি ভাগে বিভক্ত সর্বমোট ২৪০টি উনুনে রান্না হয়। প্রত্যেকটি উনুনে পর পর সাজানো নয়টি মাটির পাত্রে ব্যঞ্জন রান্না করা হয়। সবথেকে উপরের পাত্রটির ব্যঞ্জন সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। অন্ন থেকে ফ্যান গলানো হয় না এবং তরকারিও নাড়া হয় না। কেবল রান্নার শেষে স্বাদের জন্য জিরে, হিং, গোলমরিচ, নুন ও আদাবাটা দেওয়া যেতে পারে। নীলাদ্রিমহোদয়, স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণ থেকে জানা যায় মহাপ্রভুর নৈবেদ্য প্রস্তুতিতে পাচক বৈষ্ণবাগ্নি, পাচিকা মহালক্ষ্মী এবং পাক-বিশোধক অগ্নীশ্বর মহাদেবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রায় ৫০০ জন সেবক রন্ধনশালায় সেবা দিয়ে থাকেন। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড অনুযায়ী ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের সঙ্গে শূদ্র সেবকরাও রন্ধনকার্যে নিযুক্ত থাকেন। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম', তাই রন্ধনশালার সেবকদের পেট ভরে খেয়ে এসে কার্যে নিযুক্ত হতে হয়, যাতে ভোগ রান্নার সময় মনে কোনও বিরূপ ভাব না আসে। শ্রীমন্দিরের পরিসরে থাকা কেবলমাত্র গঙ্গা ও যমুনা নামে দুটি কূপের জল রন্ধনকার্যে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক ত্রুটিশূন্য এই কূপ দুটির জল অত্যন্ত সুস্বাদু। গ্রীষ্মকালেও এই দুটি কূপে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল থাকে। বামদেব সংহিতায় রন্ধনপাত্র ও জ্বালানি কাষ্ঠ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। ওই গ্রন্থ থেকে জানা যায় মহাপ্রসাদ প্রস্তুতির জন্য পাত্রগুলির রং লাল হওয়া বিধেয়। কাঁটা, ক্ষীরযুক্ত, বজ্রসদৃশ ও কীটদষ্ট কাষ্ঠ রন্ধনে ব্যবহৃত হয় না।

ষড়বিধ সংস্কারের মাধ্যমে শ্রীজগন্নাথদেবের নৈবেদ্য প্রস্তুত হয়। প্রথম সংস্কারে বৈষ্ণবাগ্নিতে মহালক্ষ্মীর অন্নব্যঞ্জন রন্ধন, দ্বিতীয় সংস্কারে রত্নসিংহাসনের সামনে শ্রীচক্রে স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিতলের পাত্রে নৈবেদ্য পরিবেশন, তৃতীয়ত দ্বাবিংশাক্ষরী পাতাল নৃসিংহমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলে প্রোক্ষণ, চতুর্থত গোবিন্দ অষ্টাদশাক্ষরী গোপাল মন্ত্রে 'ক্লীং' বীজাক্ষরে নিবেদন, পঞ্চমত ভৈরবীযন্ত্রারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবকে উৎসর্গ ও শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলাকে সমর্পণ। শেষ সংস্কারে বিশ্বকেশন, শুক, প্রহ্লাদ, নারদ, মহাবীর, বৈনতেয়, দেবল ও ইন্দ্রদ্যুম্ন— অষ্টসাত্ত্বিক বৈষ্ণবকে অন্নবলির মাধ্যমে এই প্রসাদ মহাপ্রসাদের মান্যতা লাভ করে। এই সমস্ত

প্রক্রিয়া তান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। স্নানযাত্রার পরে অনবসর (শ্রীজগন্নাথদেবের জ্বরভোগের সময়), নবকলেবরকালীন মহানবসর ও রথযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথদেবের অবর্তমানে নৈবেদ্য নৃসিংহদেবকে সমর্পণ করে দেবী বিমলাকে পুনঃসমর্পিত হয়ে মহাপ্রসাদের মান্যতা লাভ করে। কিংবদন্তি, একদা মা পার্বতী ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদ সেবনের অনেক চেষ্টা করে বিফল হয়ে কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর দীর্ঘ বারো বছরের তপস্যায় ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "তোমার এই ইচ্ছা বর্তমানে পূরণ হওয়ার নয়। কলিযুগে যখন আমি শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা সহ শ্রীমন্দিরে রত্ন সিংহাসনে দারুব্রহ্ম রূপে বিরাজিত থাকব এবং তুমি বিমলা রূপে পূজিত হবে তখন আমাকে নিবেদিত নৈবেদ্য তোমাকে সমর্পণ করা হবে। তুমি সেই নৈবেদ্য গ্রহণ করার পর তা মহাপ্রসাদে পরিণত হবে।"

শ্রীজগন্নাথদেবের নৈবেদ্যের পরিমাণ ষাট পউটি। আগে ওড়িশায় শস্য মাপার একক হিসাবে পউটি শব্দ ব্যবহৃত হত। এক পউটি হল ৮০ কিলো। ষাট পউটি শস্যের পরিমাণ ৪৮০০ কিলো। তাই দুঃখে, বিপদে বিধ্বস্ত ভক্ত অভিমানে প্রভুকে বলে, "ষাঠিয়ে পউটি ভোগরু তুমর কাড়ি ত নেইনি হরি, / কুহ তেবে কেউঁ অপরাধে মোতে কল দাণ্ডর ভিখারী" অর্থাৎ "হে হরি, তোমার ষাট পউটির ভোগ থেকে কিছু তো আমি নিইনি। তবে কোন অপরাধে তুমি আমাকে রাস্তার ভিখারি করেছ?"

সাধারণত দুরকমের ভোগ মহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয়—কোঠভোগ ও ছত্রভোগ। সকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালীন ভোগকে কোঠভোগ বলা হয় যা ত্রিসন্ধ্যা ভোগ নামে খ্যাত। আইন অনুযায়ী ১৯৬০ সাল থেকে রাজ্য সরকার শ্রীমন্দিরের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেও পুরীর গজপতি মহারাজই বংশানুক্রমিকভাবে শ্রীমন্দিরের সম্মানিত মুখ্য সেবক। ছত্রিশ রকমের সেবায়েত তাঁদের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা মহাপ্রভুকে একশো উনিশ প্রকারের সেবা দিয়ে থাকেন।

ত্রিসন্ধ্যা ভোগে রত্নসিংহাসনের সামনে তণ্ডুলচূর্ণে দেওয়া চতুষ্কোণ আল্পনার ওপর স্বর্ণ, রৌপ্য, ও পিতলের পাত্রে তিনটি বিগ্রহকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। অবিবাহিত, ব্যাধিগ্রস্ত, অঙ্গহীন ও দগ্ধদাগযুক্ত ব্যক্তির মহাপ্রভুর পূজাধিকার নেই। পূজাপাণ্ডারা উপনয়ন ও বিবাহ হলে সেবায় নিযুক্ত হন; অন্যান্য সেবকরা উপনয়নের পরে সেবাধিকার পেতে পারেন। নির্দিষ্ট কোনও সেবায়েত গোষ্ঠী শুধুমাত্র অবিবাহিত অবস্থায় সেবা দিতে পারেন। পূজাপাণ্ডাদের সংস্কৃত ও পূজাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হতে হয়। গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাসহকারে তিন-চার বছর অধ্যয়নের পর সেবায়েত গোষ্ঠীর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি পণ্ডিতমণ্ডলী ও বহু ভক্তের সামনে তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। পরীক্ষার সময়সীমা ৩ ঘণ্টা। উত্তীর্ণ হলে সেবায়েতরা প্রথমে শ্রীবলভদ্রের পূজাধিকার লাভ করেন। আট-দশ বছর সেবা করার পর আবার তাঁদের পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁরা দেবী সুভদ্রার পূজা করেন। আবার আট-দশ বছর মা সুভদ্রার সেবার পর তাঁদের আর একবার পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে তাঁরা শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার লাভ করেন। নচেৎ তাঁদের আবার অধ্যয়ন করতে হয়। পূজাপাণ্ডারা কোনও পাশ্চাত্য পোশাক পরিধান করেন না। খোঁপার মতো চুল রাখা ও তাতে তুলসি বা ফুল বাঁধা তাঁদের অবশ্যই পালনীয়। অন্ধকার গর্ভগৃহে কেবল প্রদীপের আলোয় তন্ময় অবস্থায় তাঁরা পূজা করে থাকেন।
ভোগ নিবেদনের সময় জলগণ্ডুষে বিগ্রহদের পূর্ণ ।২৭।

অবয়ব দর্শন করতে পারলে তবেই তাঁরা ভোগ নিবেদনের জন্য মহাপ্রভুর অনুমতি লাভ করেন। ভোগ নিবেদনকালে শ্রীমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার মতো কোনও অঘটন ঘটলে, যেমন জীবনহানি বা রক্তপাত হলে, কেউ মলমূত্রত্যাগ বা বমি করলে, কুকুর প্রবেশ করলে, সমস্ত নৈবেদ্য পুঁতে দেওয়া হয় ও পাকশালা শুদ্ধ করে পুনর্বার রন্ধনের পর ভোগ ওঠে।

রাজা যযাতিকেশরী (প্রথম) সকড়ি ভোগের ব্যবস্থা করেন। সকালের ভোগের পর মহাপ্রভুর বেশ পরিবর্তন করা হয়। এরপর ভোগমণ্ডপে ছত্রভোগ বা ভঅণ্ড ভোগের আয়োজন করা হয়। প্রসঙ্গত ওড়িশায় মন্দিরগুলি ভোগমণ্ডপ, জগমোহন, বিমান ও গর্ভগৃহ—এই চারভাগে বিভক্ত। ভক্তদের আবশ্যক পরিমাণে মহাপ্রসাদ জোগানের জন্য গোবর্ধন মঠের শ্রীশঙ্করাচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী নবম শতাব্দী থেকে ভোগমণ্ডপে ভোগ নিবেদন আরম্ভ হয়। ভোগমণ্ডপ থেকে ভঅণ্ড শব্দটি এসেছে। এই ভোগের অন্য নাম বরাদ্দি ভোগ বা উপাধি ভোগ যা কেবলমাত্র রাজপরিবার বা মন্ত্রী বা রাজগুরু, বিভিন্ন মঠের অতিথি-অভ্যাগত ও সাধুদের জন্য বরাদ্দ দিয়ে করান। পূর্বে শ্রীমন্দিরের কাছে বড় রাস্তার দুপাশে তালপাতার ছাতার নিচে সাধুরা ধুনি জ্বালিয়ে জপধ্যান ও কীর্তনে রত থাকতেন। বহু বদান্য ব্যক্তি তাঁদের জন্য মঠাধীশদের প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করতেন। সেই অর্থে নিবেদিত ভোগ ছাতার নিচে থাকা সাধুসন্তদের মধ্যে বিতরিত হত। তাই এই ভোগকে ছত্রভোগ বলা হয়।

কোঠভোগে ষোড়শোপচার ও ছত্রভোগে পঞ্চোপচারে পূজা হয়। কোঠভোগের সময় পাতলা পর্দা দেওয়া হয়। কিন্তু ছত্রভোগে পর্দা থাকে না; ভক্তগণ জগমোহনের দুপাশে এসে পূজা দেখতে পারেন। কোঠভোগের সময় পুরাণপাণ্ডা পুরাণ পড়তে থাকেন, যা ছত্রভোগে হয় না। কোঠভোগ সীমিত, ছত্রভোগ প্রচুর। কোঠভোগ ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার হয়ে থাকে। কিন্তু ছত্রভোগ আবশ্যকতা অনুসারে অনেকবার হতে পারে। কোঠভোগ শ্রীমন্দিরের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বন্দোবস্ত করা হয়। ছত্রভোগ বিভিন্ন মঠ ও ব্যক্তিবিশেষের অর্থে আয়োজিত হয়। এই ভোগ মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে না হয়ে পরোক্ষ দৃষ্টিতে হয়ে থাকে। ছত্রভোগে কেবল তিন বিগ্রহের ভোগ হয়; চক্র সুদর্শন, মাধব, ভূদেবী ও শ্রীদেবীর স্বতন্ত্র ভোগ থাকে না; কিন্তু কোঠভোগে তা থাকে। কোঠভোগে বিগ্রহদেরকে নিবেদিত নৈবেদ্য বিমলা দেবীকে সমর্পণ করা হয়। ছত্রভোগে তিন দেবতাকে ভোগ নিবেদনের পর সেই ভোগ ভোগমণ্ডপের কাছে থাকা ভট্টারিকা কালীকে পুনঃসমর্পিত হয়ে থাকে। ছত্রভোগে ভোগের পর কর্পূর আরতির পরিবর্তে ঘি-সলতের আরতি হয় ও চন্দনগুঁড়োর ধূপ দেওয়া হয়।

ভোগের পরিমাণ বেশি হলে দ্বিপ্রহর ধূপের পরে ‘পরবর্তী ছত্রভোগ’ নামে একাধিক ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে। শ্রীক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে অধিক তীর্থযাত্রীর সমাগমের কারণে এই ছত্রভোগের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। কোঠভোগের মহাপ্রসাদ রাজপরিবার ও শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায়েতগণ পান। শ্রীশঙ্করাচার্য মহাপ্রভুর রীতিনীতিতে অনেক সংস্কার এনেছিলেন বলে গোবর্ধন মঠেও ‘গুরুথালী’ পাঠানো হয়। অবশিষ্ট মহাপ্রসাদ আনন্দবাজারে বিক্রয় হয়। সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ শ্রীমন্দিরের আয়রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু ছত্রভোগ সর্বসাধারণের জন্য উদ্দিষ্ট।

কোঠভোগ ও ছত্রভোগে থাকে নয় রকমের অন্ন, সাত রকমের পান্তা, নয় রকমের পিঠে ও

দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন, চোদ্দো রকমের তরকারি ও তিন রকমের ডাল। কিছু অসকড়ি ভোগও নিবেদন করা হয়, যেমন ঝিল্লি, আরিসা, কাকরা, মালপোয়া, গজা, মনোহর, কদমা, বীরখণ্ডি ইত্যাদি। করমাবাঈ খিচুড়ি, সুআর পিঠে, মরীচিপানি, হনুমন্ত দাসিয়ার মতো কিছু নৈবেদ্য ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তদের সঙ্গে সুমধুর লীলার স্মৃতি বহন করে।

এছাড়া অন্যান্য ভোগের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রথম ভোগ বালভোগ বা গোপালবল্লভ ও শেষ ভোগ বড়সিংহার ভোগ প্রধান। এই দুই ভোগে বিগ্রহদের পঞ্চোপচারে পুজো হয়। গোপালবল্লভ ভোগমণ্ডপে ও বড়সিংহার ভোগ রত্নসিংহাসনের নিচে আলপনা ছাড়াই নিবেদন করা হয়। গোপালবল্লভ ভোগে মাখন, দই, রাবড়ি, খোয়া, নারকেল নাড়ু, সাকর এবং বিভিন্ন ঋতুর ফল নিবেদিত হয়। বড়সিংহার ভোগে বিভিন্ন রকম পিঠে, কাঁচকলা ভাজা, কড়ি ও ঘি দেওয়া পান্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জায়ফল, সুপারি, কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গ দেওয়া পান প্রতি ভোগের অপরিহার্য অঙ্গ। রোজ মহাপ্রভুকে ১০৪ খিলি পান নিবেদন করা হয়।

বিভিন্ন উৎসবে বিশেষ বিশেষ নৈবেদ্য থাকে। যেমন 'অধরপানা' আষাঢ় শুক্লা দ্বাদশীতে রথের উপর ভোগ দেওয়া হয়। অধর হাঁড়িগুলির উচ্চতা পাঁচ থেকে সাড়ে চার ফুট। দশ ঝুড়ি এঁটেল মাটি দিয়ে চার-পাঁচ জন কুম্ভকার মিলে হাঁড়িগুলি নির্মাণ করেন। লাল রঙের হাঁড়িগুলি ভাটিতে পুড়তে তিনদিন লাগে। জল, চিনি, ছানা, দুধ, সর, কলা, এলাচ, গোলমরিচ, ও নবাত (কেবল চিনিতে তৈরি মিষ্টান্ন) দিয়ে প্রস্তুত অধরপানা নিবেদন করেই রথের পার্শ্বদেবতা ও অশরীরীদের উদ্দেশে হাঁড়িগুলি ঘণ্টার সাহায্যে ভেঙে দেওয়া হয়। কোনও মানুষের এই প্রসাদ গ্রহণের বিধি নেই। 'নীলাদ্রি বিজে' বা রথযাত্রার শেষে শ্রীমন্দিরে প্রবেশের সময় মহালক্ষ্মীর মানভঞ্জনের প্রেমমধুর নৈবেদ্য হল রসগোল্লা যা বছরে এই একবারই মহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয়। জন্মাষ্টমী ও রামনবমীর আগের রাতে মহাপ্রভুকে এক বিশেষ পথ্য নিবেদন করা হয় যা আসন্নপ্রসবা মায়েদের খাদ্য। মহাপ্রভু নিজেই নিজের মা হয়ে সুখপ্রসবের জন্য এই পথ্য গ্রহণ করেন। মনে রাখতে হবে শ্রীজগন্নাথ দক্ষিণ কালিকারূপেও পূজিত হন।

সিদ্ধ চাল, আলু, টমেটো, সজনে ডাঁটা, কাটোয়ার ডাঁটা, লাউ, পেঁপে, ট্যাঁড়শ, বরবটি, পুঁই, তিন রকম কপি, বিনস, গাজর, সবুজ মটর, পেঁয়াজকলি, ক্যাপসিকাম, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজ, রসুন ও কাজুবাদাম শ্রীমন্দিরের পাকশালায় নিষিদ্ধ। নটে শাক ও লাল শাক ছাড়া অন্যান্য শাকও নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র কার্তিক মাসে অগস্তি শাকের ব্যঞ্জন নিবেদিত হয়। লঙ্কার পরিবর্তে গোলমরিচ ও সাধারণ লবণের পরিবর্তে সৈন্ধব লবণ ব্যবহৃত হয়। উত্তেজক দ্রব্য তেল, গরম মশলা ও পোস্ত নৈবেদ্য রন্ধনে নিষিদ্ধ।

মহাপ্রসাদ সেবনে কিছু বিধিনিষেধ অবশ্যই পালনীয়। আসনে বসে মহাপ্রসাদ সেবন অনুচিত। শ্রীজগন্নাথ ও তাঁর মহাপ্রসাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ না থাকায় ওড়িশাবাসী ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদনের পর মাটিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পুরুষরা কাছা দিয়ে ও মহিলারা মাথায় আঁচল দিয়ে প্রভুচিন্তন করতে করতে নীরবে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করছেন, এটি উৎকলের গ্রাম্যজীবনের অতি পরিচিত এক পবিত্র ও মধুর দৃশ্য। মহাপ্রসাদের সঙ্গে অন্য কোনও রন্ধনদ্রব্য বা আমিষ তো দূরস্থান, কোনও পাকা ফল, পিঁয়াজ বা রসুনও খাওয়া চলে না। মহাপ্রসাদ সেবনের পর হাত ও বাসন এঁটো ধোয়ার স্থানে পরিষ্কার করা চলে না।

।২৯।

সম্পূর্ণ শাস্ত্রীয় বিধি মেনে মহাপ্রসাদ প্রস্তুত হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদমতে মাটির পাত্রে প্রস্তুত অন্ন, ব্যঞ্জন সর্বদা স্বাস্থ্যের অনুকূল। রসুন ও পিঁয়াজ না থাকায় মহাপ্রসাদ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, শুক্র ও ওজসের পুষ্টিবিধান করে। শুকনো নৈবেদ্য যেমন বিভিন্ন রকম পিঠে, মিষ্টি ইত্যাদি সম্পূর্ণভাবে গব্যঘৃতে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ঘৃত জঠরাগ্নিকে প্রজ্বলিত করে রাখে, মেধাকে সুতীক্ষ্ণ করে এবং শরীরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। মহাপ্রসাদে শ্বেতসার ষাট শতাংশ, পুষ্টিসার কুড়ি শতাংশ, স্নেহসার কুড়ি শতাংশ ও তন্তু থাকে। পান্তা প্রসাদে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোবায়োটিক থাকে যা পাকস্থলির ব্যাকটেরিয়াদের কর্মক্ষম করে। নিবেদিত পানে চুন, খয়ের বা অন্য কোনও উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না। পানের বহু ঔষধীয় গুণ। ক্যালসিয়াম, ক্যারোটিন, থাইয়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নিয়াসিন, ট্যানিন, শর্করা, ভিটামিন সি ও ক্যাভিকল নামে শক্তিশালী অ্যান্টিসেপটিক পানে থাকে। এই পান বাত, পিত্ত ও কফ নিরসনে সুফল দেয়।

মহাপ্রভুর মহিমা যেমন অপার, তাঁর মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যও তেমন অচিন্তনীয়। কপিল সংহিতা বলেন, "জগন্নাথো যথা সাক্ষাদ্ দর্শনান্মুক্তিদো ধ্রুবম্।/ তথৈব মুক্তিদং হ্যন্নং জগন্নাথস্য ভো দ্বিজাঃ॥" অর্থাৎ যেমন (বাসনাশূন্য মনে) জগন্নাথদর্শন করলে মুক্তি নিশ্চিত, তেমনই তাঁর অন্নপ্রসাদ দর্শনেও মুক্তি। ওড়িশার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ। অন্নপ্রাশন, কর্ণবেধ, উপনয়ন, আশীর্বাদ, বিবাহ ও মৃত্যুতে মহাপ্রসাদ না হলে চলে না। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন, এমনকী শপথ গ্রহণেও মহাপ্রসাদ স্পর্শ এক অলঙ্ঘ্য রীতি। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের এক পাত্র থেকে মহাপ্রসাদ গ্রহণে স্পর্শদোষ হয় না। স্কন্দপুরাণ অনুযায়ী কুকুরের মুখ থেকে পড়ে যাওয়া মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণেরাও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন।

"কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টম্ তদন্নং পতিতং যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্বপাপাপনোদনম্॥"

একাদশীর দিন অন্নভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু পুরীধামে মহাপ্রভুর অন্নপ্রসাদ গ্রহণে কোনও বিধিনিষেধ নেই।

জগন্নাথদেবের ভোজনব্যবস্থা তাঁর ঐশ্বর্যলীলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অসংখ্য রাজকীয় ব্যঞ্জন অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে প্রস্তুত করে মহাপ্রভুকে নিবেদন করা হয়। সমগ্র পৃথিবীতে এমন ব্যবস্থা ও অত পরিমাণে নৈবেদ্য প্রস্তুতি অন্যত্র দুর্লভ। মহাপ্রভু দ্বারকায় অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও সুদামার চালভাজা ভুলতে পারেননি, তেমনই শ্রীমন্দিরে মহালক্ষ্মীর ঘৃত-মধু দিয়ে প্রস্তুত ব্যঞ্জন গ্রহণ করার সময়ে করমাবাঈয়ের অশৌচ অবস্থায় প্রস্তুত শ্রদ্ধামিশ্রিত খিচুড়ি ভুলতে পারেননি, ভুলতে পারেননি অন্ত্যজ ভক্ত দাসিয়ার গাছের নারকেল, ভুলতে পারেননি শবর বিশ্বাবসুর কাঁচা রাঙালুর নৈবেদ্য। রত্নভাণ্ডারে অজস্র রত্নপাত্র থাকলেও শ্রীজগন্নাথদেবের প্রিয় রন্ধনপাত্র মাটির হাঁড়ি। এখানে ঐশ্বর্য ও মাধুর্য মিলেমিশে একাকার। অপরিমেয় ভাব ও অফুরন্ত গাথাকে নিয়ে গড়ে ওঠা জগন্নাথ চেতনা ও সংস্কৃতি মানবের বোধগম্যের বাইরে। তাই কার্য-কারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত হয়ে কেবল গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূর্ণ শরণাগতি নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে নিজেকে নিবেদন করতে পারলেই কৃপাসাগরের কৃপাকণিকা থেকে কেউই বঞ্চিত হবে না। নি

১৩০১